নতুন রচনা

হিয়া মুখোপাধ্যায়

ম্যানিকি ও মাথুর

গীতা দত্ত আবার গাইছেন। অন্ধকারের সিল্যুয়েট ভেদ করে আলোর রেখাগুলি মাড়িয়ে ধীরপায়ে হেঁটে যাচ্ছেন দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। সামান্য ঝুঁকে পড়া কাঁধ, কালো ওভারকোট, কপালের দুপ্রান্তে রুপোলী দু একটা রেখা। একটা অস্পষ্ট, ভারী অথচ উজ্জ্বল ব্যথাবোধের উপর ক্যামেরা ফোকাস ফেলে। স্ক্রীন জুড়ে বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর পাদুকোনের ভাঙাচোরা মুখ। গুরু দত্ত নাম নিয়ে তিনি তখন হাঁটছেন, হেঁটেই যাচ্ছেন, লং শট থেকে ক্লোজ আপ। তারপর থেমে গিয়ে পিছনে ফিরছেন। অনতিদূরে (নাকি বহুদূর?) পোর্সিলিনের মত চাউনি নিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওয়াহিদা রহমান। মৃত্যুর মত সাদা আলো তার মুখে। অভিব্যক্তিহীন। স্থানু। আর গীতা দত্ত গাইছেন ' তুম ভি খো গয়ে/ হাম ভি খো গয়ে/ এক রাহ পর চলকে দো কদম।'

অথচ তখন নাকি দুজনের সম্পর্ক যথেষ্ট ঝোড়ো। ডাবিং- এর জন্য রীতিমতো সাধ্যসাধনা করে রাজী করাতে হয়েছিলো ওয়াহিদাকে। খুব সম্ভবত গীতা দত্তই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। স্বামীর সাথে অন্য মহিলার ঘনিষ্টতায় সমস্যা হত। সে থেকেই তিক্ততা। অথচ ওয়াহিদা তো মিউজ! গুরুর মিউজ। প্রেয়সী ও প্রেরণার মাঝবরারের সাঁকো বেয়ে তখন হেঁটে যাচ্ছেন গুরু দত্ত। আর মাত্র পাঁচবছর বাদেই, ১৯৬৪ সালের এক সকালে মুম্বাই এর পেদ্দার রোডের ফ্ল্যাটে নিথর অবস্থায় পাওয়া যাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষকে। মেডিকাল রিপোর্ট বলবে ওভারডোজ অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড স্লিপিং পিলস। অক্টোবরের দৈবাধীন জোৎস্নায় ‘তবু সে দেখিলো কোন ভূত?’ সৃষ্টি ও ধ্বংসের সনাতন ঘূর্নাবর্ত। আর এর ঠিক আট বছর পর চলে যাবেন গীতা। কোথায় যাবেন? ‘যায়েঙ্গে কঁহা/সুঝতা নেহি/চল পড়ে মগর রাস্তা নেহি...’

আর এরপর ২০২০ সালে সে স্ক্রীনে চোখ ফেলবে। ক্যামেরা জুম ইন করছে ওয়াহিদার পাথর হয়ে যাওয়া মুখে। আলো। অন্ধকার। আলো। অন্ধকার। চিরন্তন ডুয়ালিটি। শুধু বৈপরীত্য নয়, দমবন্ধ হয়ে আসা বৈপরীত্য। সাভানায় দৌড়ে চলা জেব্রার সংহত গ্রীবার মত। কাটা কাটা। ওই যেখানে সমীহ করার মত অন্ধকার থেকে আউট অফ ফোকাস দুটো ছায়ামূর্তি মিলিত হচ্ছে চোখ ঝলসে দেওয়া আলোয়। আর তার মনে পড়বে দ্য অটাম অফ দ্য মিডল এজেস এ শুরুর পাতাতেই জোহান হুজিঙ্গা বলেছিলেন, পৃথিবী যখন তরুণ ছিলো তখন ঘটনাপ্রবাহের চারপাশে একটা সুস্পষ্ট প্রান্তরেখা থাকতো। দুঃখ আর আনন্দ, সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য, প্রেম আর বিচ্ছেদ...অলঙ্ঘনীয় দুরত্বের দু দিক। আনন্দ আর বিষাদ ছিলো অমিশ্রিত। অপাপবিদ্ধ। শিশুর চেতনায় যেমন। হুজিঙ্গা দুঃখ করেন ‘দ্য মডার্ন সিটি হার্ডলি নোজ পিওর ডার্কনেস অর ট্রু সাইলেন্স এনি মোর, নর ডাজ ইট নো দ্য এফেক্ট অফ আ সিঙ্গল স্মল লাইট অর দ্যাট অফ আ লোনলি ডিসট্যান্ট শাউট’।

এই আলোচনা সে ২০২০ তে শুনেছে। যা ঔপন্যাসিক জন ব্যানভিলের কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল প্রসঙ্গক্রমে। তিনি তখন স্থানীয় এক প্রফেসরের সাথে পথ হাঁটছেন কম্যুনিস্ট শাষিত প্রাহা শহরের ফুটপাথে। সেই অ্যালকেমি আর ম্যাজিকে বুঁদ হয়ে থাকা পূর্ব ইউরোপিয় শহর। অন্ধকার আর আলোর মধ্যে লুকোচুরি খেলতে থাকা গুজবের মত। কিন্তু সেসবও তখন এক বিষম অতীত। ব্যানভিলের সেই সন্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগে। ইস্টার্ন ব্লকের প্রবাদপ্রতিম ধূসর সন্ধে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর তখন পৃথিবী অনেকটাই ফ্যাকাশে। আউজভিৎসের ছাইচাপা আগুন নিভন্ত। তদ্দিনে আলব্যের কামুও মরে হেজে ভূত হয়ে গ্যাছেন। সিসিফাস খাড়া চড়াই বেয়ে পাথর তুলছে তো তুলছেই। আর আয়রন কার্টেনের অপরপ্রান্তে ব্যানভিল হাঁটতে হাঁটতে

অতীতের স্থাপত্যের মাঝখানে খোঁজার চেষ্টা করছেন ম্যাজিক প্রাগের আত্মা। গোল্ডেন লেনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছেন। জনশ্রুতি, একদা এই গলিতেই সার সার ঘরে বসত গেড়েছিল ইউরোপের তাবৎ অ্যালকেমিস্ট, ভেলকি মাস্টার, আর তুক দেখিয়ে লোক ঠকানো চোর চোট্টা। সবই হাবসবুর্গের তৎকালীন সম্রাট রুডল্ফ- টু এর বদান্যতায় (অতিলৌকিকের প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতা ছিল সর্বজনবিদিত) । সঙ্গী প্রফেসরটি কাষ্ঠ হেসে বলেন 'ওসব গল্পকথা। অ্যালকেমি না ছাই। আসলে স্যাঁকরাদের আস্তানা ছিলো। সে থেকেই গোল্ডেন লেন। বরং যে ইতিহাসটা সত্যি, সেইটা বলি। ওই বাইশ নম্বরের চিলতে বাড়ীটা? ওখানেই নিজের প্রিয়তমা বোনের সাথে ভাড়া থাকতেন ফ্রান্জ্ কাফকা'। অতএব হুজিঙ্গার তরুণ পৃথিবী, অলৌকিকের সম্ভাবনায় তেতে থাকা পৃথিবী... নেই। গলি আটকে কাফকার ধূসরতা দাঁড়িয়ে রয়েছে কসমিক একটা মস্করার মতন। মস্করাই বটে। সোশ্যালিস্ট ব্লক, মুক্ত দুনিয়া, ইজরায়েল- আরব সঙ্কট....নিদারুণ আর অসহ্য, ধূসর রসিকতা। আধুনিকতার সূত্রপাত।

টিমটিমে সোডিয়াম লাইটের সেপিয়া ইউরোপ থেকে সে সটান ফিরে আসে কলকাতায়। বাংলার স্যার ঘোলাটে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অ্যাবসার্ডিটির সংজ্ঞা বোঝাচ্ছেন তাকে। 'মনে রাখবে, প্রত্যেকটা আধুনিক মানুষই আসলে ভয়ানক রকমের একা'।

সে ছাই রঙের ফ্লোতে ভাসতে ভাসতে জাম্প কাটে ২০২০ তে ফিরে আসছে। মনে পড়ে এই তো কদিন আগেই সে এস্তোনিয়ার একটা সিনেমা দেখেছিলো। নভেম্বরের রুপকথা। আর পৃথিবীর আর পাঁচটা রুপকথার মতই সহজাতভাবে নিষ্ঠুর। সে এক আজব গ্রাম। প্রেত আর খোক্কস আর ডাইনি আর অরণ্যের পিশাচ। গ্রামের সাধাসিধে মেয়ে। চাষার পো। মড়ক। দূর্ভিক্ষ। শীত। আর এর মাঝে ডিউকের দূর্গ। ডিউকের অনিন্দ্যসুন্দিরী কিশোরী কন্যা। সাদা মসলিনের পোশাকে যে ঘুমের ঘোরে অন্ধকার প্রাসাদের অলিতে গলিতে হেঁটে বেড়ায়। চাষার ছেলে তার প্রেমে পড়ে। অথচ সে ছেলেকে আবার গোপনে ভালোবাসে গ্রামেরই এক সাদামাটা মেয়ে। রিক্ত, ঝুলহাতা পোশাক আর উলোঝুলো চুলের নায়িকা। যেভাবে গল্প শুরু হয় সাধারণত। হিংসেয় জ্বলতে জ্বলতে ডাইনির কাছ থেকে মন্ত্রপুতঃ তীর নিয়ে সে মেয়ে ডিউককন্যাকে প্রাণে মারতে যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় সে আবিষ্কার করে দানবের মত কালো প্রাসাদের ন্যাড়া ছাদের ঠিক প্রান্তে এসে থমকে আছে সাদা মসলিন। ঘুমের মধ্যে আর এক পা এগোলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। চাষার মেয়ে প্রাণে বাঁচায় ঘুমন্ত ডিউকের মেয়েকে। তার ঘুমের মধ্যেই। মন্ত্রপুতঃ তীর ধনুক, অব্যবহৃত পড়ে থাকে কম্পাউন্ডের গাছতলায়। 'তবু সে দেখিলো কোন ভূত?'

আর তারপরই যখন সিনেমার শেষ দৃশ্যে বরফের উপর দুটো মৃতদেহ বয়ে দুদিকে বেঁকে যাচ্ছে শোক মিছিল, আর সে দেখছে তাঁর সুতীব্র কষ্ট হচ্ছে, তখন সে বোঝে নির্দেশক তাকে যথাসাধ্য ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ সাদা আর কালোর ব্যবহার। কারণ মনোক্রোম। কারণ বার্ন আউট করে যাওয়া সকালের আলোয় যখন জলে ভেসে যাচ্ছে কালো কফিন, অথবা ওই চূড়ান্ত বাঁকবদল, যখন কালো প্রাসাদের ন্যাড়া ছাদে ধবধবে সাদা মসলিনে বোনচায়নার পুতুলের মত ঘুমন্ত ডিউক কন্যাকে পিছন থেকে আলতো পায়ে জীবনের দিকে টেনে নিচ্ছে দ্বিগুণ কালো, অন্ধকার আর কাদায় মাখামাখি নায়িকা, তখন আসলে মনে মনে সে ফিরে যাচ্ছে ১৯৫৯ সালে, যখন ওয়াহিদা সেটে দাঁড়াচ্ছেন একটা পাথরের মূর্তির মত আর সে দৃশ্যতে গলায় রক্ত তুলে, তীব্র হিংসে চেপে গাইছেন গীতা- 'বেকরার দিল/ ইস তরাহ্ মিলে/ জিস তরাহ্ কভি/ হাম যুদা না থে... '

তারপর সে খুব কষ্ট করে নিজের বিচ্ছেদ মনে করার চেষ্টা করে। ২০২০ সালে দাঁড়িয়ে। যেখানে ছেলেটির নাম প্রিয়তোষ অথবা অনিন্দ্য। যেখানে তার নাম রাই অথবা ভার্গবী। যেখানে তাদের প্রেম হয়েছিল অথবা হয় নি। কিন্তু বিচ্ছেদটুকু ছিলো। অন্তত সে খুব নির্দিষ্টভাবে তার একটা রূপরেখা বিস্তার করতে চেয়েছিলো। যেহেতু ডন ডেলাইলো তাকে শিখিয়েছিলেন ' দ্য জিনিয়াস অফ দ্য প্রিমিটিভ মাইন্ড ইজ দ্যাট ইট ক্যান

রেন্ডার হিউম্যান হেল্পলেসনেস ইন নোবল অ্যান্ড বিউটিফুল ওয়েজ'। যেহেতু প্রতিটি বিচ্ছেদই এক ধরণের আদিম সারল্য দাবী করে। থাকা আর চলে যাওয়ার মাঝের অনতিক্রমটুকু স্পেসটুকু প্রতিটি বিচ্ছেদেরই হয়তো প্রাপ্য। আদিম আর অলৌকিক। যখন আলোর একশো শতাংশ নিশ্চয়তা থেকে নিকষ অন্ধকারে পা ফেললে প্রেত অথবা প্রেমিক যে কারো সাথেই দ্যাখা হয়ে যাওয়া সম্ভব। ষোড়শ শতকের প্রাগ শহরের মত।

কিন্তু এও কি নিছক সমাপতন যে ডন ডেলাইলার উপন্যাসের নামও ছিলো 'হোয়াইট নয়েজ' আর ২০২০ সালে রাই অথবা ভার্গবী নামের মেয়েটি যখন একবারো পিছনে না তাকিয়ে শেষবারের মত সনাতন ভঙ্গীতে হেঁটে যাচ্ছে পথ ফিরত ট্যাক্সির জানলায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা প্রিয়তোষ অথবা অনিন্দ্য নামের ছেলেটির থেকে দূরে, তখন সময়টা নভেম্বর আর শহরটা কলকাতা। অর্থাৎ ধোঁয়াশা, নিয়ন, সেলস কাউন্টার আর টর‍্যাফিক সিগন্যালের অশ্লীল ক্যাকফোনির মধ্যে, আরো পঞ্চাশজন হাক্লান্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারের মিছিলে একান্নতম মুখ হয়ে, নিতান্তই অকিচিন্তিৎকর একটা বাড়ী ফেরা হয়ে, তখন ভেঙ্গে যাওয়া প্রেম আর বিচ্ছেদ তার সবরকম গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ পরদিন যখন সে খানিকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবেই ১৯৫৯ সালের ফিল্ম স্টুডিওয় ফিরবে, যেখানে গুরু দত্ত চলে যাচ্ছেন, ওয়াহিদা রহমান দাঁড়িয়ে থাকছেন আর গীতা দত্ত গাইছেন 'ওয়াক্ত নে কিয়া কেয়া হাসিন সিতম', চিরায়ত আলো আর চিরায়ত অন্ধকারের মাঝখানে পুরুষ ও প্রকৃতির চিরায়ত বিচ্ছিন্নতা হয়ে, তখন সে বুঝবে, সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ২০২০ সালের খোলা পৃষ্ঠাগুলো তখন মাড়ক আর হাটবাজারের চিলচিৎকারের মধ্যে ঝাপসা হতে থাকবে। আর সে বুঝবে মানুষ কেনো যুদ্ধে যায়। সে বুঝবে নস্টালজিয়া আসলে একধরণের চেপে রাখা অসহায়তা। যা ছিলোর থেকেও বেশী, হয়তো বা, যা হতে পারেনি সেটুকুকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে না পারার অসহায়তা। আর এই সর্বগ্রাসী ধূসরের প্রেক্ষাপটে গীতা দত্ত একটানা গেয়েই যাবেন, 'তুম রহে না তুম/ হাম রহে না হাম'।

=x=x=x=

হিয়ার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। প্রথাগত পড়াশোনা পদার্থবিদ্যায়। লিখেছেন 'কবিসম্মেলন', 'মাসিক কবিতাপত্র', 'বাক', 'ডিসাপয়েন্টেড হাউজওয়াইফ', 'ভায়াভ্যা পোয়েট্রি', 'ভিজিট্যান্ট লিট' এর মত একাধিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে। প্রকাশিত গ্রন্থ- *মোহময় পেস্ট্রির দিন*, *ফ্যাকাশে মানুষের জন্য গোলাপী বড়ি* ও *প্রোজ্যাক ব্লুজ*। বর্তমানে *অ্যাগনি অপেরা* ওয়েবজিন সম্পাদনার সাথে যুক্ত।